প্রথম অধ্যায়

সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তর
বাংলায় মনসামঙ্গল কাব্যের বিকাশ

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেণীর ধর্মীয় আখ্যান মূলক কাব্য প্রচলিত ছিল। এই কাব্যগুলিতে এক একজন দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করা হত। এই শ্রেণীর আখ্যানকাব্যগুলিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১] মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য প্রধান প্রধান যে ধারাগুলিতে প্রবাহিত হয়েছিল ডঃ সুকুমার যেন সেগুলিকে তিনটি শাখায় বিন্যস্ত করেছেন। এগুলি হল গীতি কবিতা, পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং অপৌরাণিক গেয় কবিতা।[২] এই তৃতীয় কবিতা শাখাটিই বাংলা মঙ্গল কাব্য নামে অভিহিত হয়। এগুলির মঙ্গল নামকরণের নানা কারণ আছে।[৩] সুকুমার বাবু বলেছেন এই শ্রেণীর কাব্যগুলি গার্হস্থ্য কারণের উদ্দেশ্যে গীত হত বলে এগুলিকে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হত।[৪] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত - যেহেতু এই কাব্যগুলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হোত তাই এগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।[৫] মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করা হোত তাঁরা ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। সম্ভবত বাংলাদেশে লৌকিক দেব-দেবীরূপে তাঁদের আদি প্রতিষ্ঠা ছিল। একদা সমগ্র ভারতে এইরকম লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।[৬] তাঁদের গ্রাম্যদেবতা বলা হত। কালক্রমে এইসব গ্রাম্যদেবতাদের কারো কারো বিলয় ঘটেছে কেউ কেউ আবার গ্রাম্যদেবতা রূপেই থেকে গিয়েছেন আবার কোন কোন দেবতা তাঁদের সীমাবদ্ধ লৌকিক পরিচয়ের ক্ষেত্র থেকে জাতীয় জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে উঠে এসেছেন।[৭] বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিতে এই শ্রেণীর দেবতাদের উত্থান ও প্রতিষ্ঠালাভের বৃত্তান্ত কীর্তিত হয়েছে। এই দেবতাদের উত্থানের পিছনে তাঁদের শক্তি ও প্রতাপের যে ভূমিকা আছে তা বাংলাদেশের বিশেষ সাংস্কৃতিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছিল। কবিরা এই দেশীয় সমাজের ভাবভূমিতে এই শক্তিমন্ত, ক্রোধী অথচ উপাসকের প্রতি করুণা পরায়ণ দেবদেবীর যে জয়কীর্তন রচনা করেছেন তা তৎকালীন বাঙালীর জীবন ও মানসিকতার পক্ষে অতিশয় উপযোগী হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর-বিদেশী বিভাষী বিধর্মী শাসকদের শাসনাধীনে বাঙালী মানসিকতার অভিব্যক্তিস্বরূপ এই কাব্যগুলির প্রকাশ ঘটে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস থেকে আমরা অনেক ধরনের মঙ্গলকাব্যের কথা পাই। তাদের মধ্যে প্রথম উদ্ভূতরূপের অনুকরণ অনুসরণ দীর্ঘকাল চলেছিল। সুতরাং একবার রূপ নির্দিষ্ট হয়ে যাবার পর প্রথাগতভাবে কবিরা সেই কাব্যের অনুকরণে আর একটি নূতনকাব্য রচনা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার এই শ্রেণীর কাব্যগুলিকে বৈষ্ণব, পৌরাণিক ও লৌকিক ভেদে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বৈষ্ণব বা পৌরাণিক

মঙ্গল কাব্যগুলি অবশ্য এই কাব্যের আদিরূপ নয়। বরং লৌকিক মঙ্গল কাব্যগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সেগুলি রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব মঙ্গল কাব্যগুলির 'অন্তপ্রকৃতি' বা বিষয়বস্তু [৮] ভিন্নশ্রেণীর। পৌরাণিক মঙ্গল কাব্যগুলির দেব-দেবীরা ছিলেন পুরাণের দেবতা। অন্যপক্ষে লৌকিক মঙ্গল কাব্যগুলিতে আমরা যে দেবদেবীর কথা পাই তাঁদের লৌকিক পরিচয় মুখ্য। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা। চন্ডী, মনসা ও ধর্ম - এই তিন দেবদেবীর মহিমা কীর্তনমূলক কাব্যগুলিই বাংলার প্রধান মঙ্গলকাব্য। তাছাড়াও এই ধারায় আরো বেশ কিছু আঞ্চলিক দেবদেবীর - যেমন শীতলা, সারদা, ষষ্ঠী - প্রভৃতির মঙ্গলগান রচিত হয়েছিল। এইরকম দশটি শাখার কথা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৯] এই সব অপৌরাণিক দেবদেবী ক্রমশ সমাজের উচ্চ বর্ণ পূজিত শিবদেবতার পূজা ক্ষেত্র অধিকার করে বাঙালী জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। এই সব লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছিল বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে। বঙ্গদেশের এক বিশেষ সামাজিক অবস্থায় এই দেবদেবী পৌরাণিক অনুলেপন লাভ করে বৃহত্তর সমাজে গৃহীত হলেন। মঙ্গল কাব্যগুলি এই লৌকিক দেবদেবীর এই সামাজিক ক্রম-প্রতিষ্ঠার আখ্যানকাব্য।[১০]

২

মঙ্গলকাব্যগুলি ত্রয়োদশ শতক থেকে রচিত হতে শুরু করে বলে অনুমান করা হলেও পঞ্চদশ শতকের আগে তাদের রচনার খুব সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতকে তাদের একটা বিশিষ্ট রূপ গড়ে উঠতে থাকে। আগে ব্রতকথা পাঁচালী আকারে প্রচলিত আখ্যানগুলি এখন ক্রমশ পুষ্ট হয়ে দেবখন্ড ও নরখন্ডে বিভক্ত দুই কাহিনীতে রূপ পায়। তাছাড়া প্রত্যেক কাব্যেরই একটা রচনার ধারা দেখা যায়। প্রত্যেক কাব্যের কবিই স্বপ্নে দেবদেবীর মঙ্গলগান করার নির্দেশ লাভ করেন ("পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ"[১১])। স্বর্গভ্রষ্ট কোনো দেবতা বা দেবোপম চরিত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দেবদেবীর পূজা প্রচারে যত্নবান হন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তাঁরা লৌকিকরূপেই বিচরণ করেন। মানবধর্ম অবলম্বন করে কোনো নির্দিষ্ট দেবতার পূজা প্রচার সম্পন্ন করে তাঁরা স্বর্গে ফিরে যান। এই ভাবে মঙ্গলকাব্যের আখ্যানগুলি একটি নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে যায়। কাব্যগুলি দেবদেবীর বন্দনা দিয়ে আরম্ভ হয়। তারপর কোনো দেবতার স্বর্গ থেকে পতন ও পৃথিবীতে জন্মলাভ বর্ণিত হয়। এই সব কাব্যের প্রধান চরিত্র সাধারণত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর মানুষ হন না। পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে সদাগর শ্রেণীর দিক থেকেই বড় বাধা দেখা দেয়। নায়ক নায়িকাকে এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে পূজা প্রচার করতে হয়। এই প্রতিকূলতা যত বেশি কাব্যের নায়ক নায়িকার ভূমিকা ততই আকর্ষক এবং তার রস পরিণতিও তত তীব্র। পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে দেবদেবী অনেক অলৌকিক শক্তির প্রদর্শন করে কার্য সিদ্ধি করতে পারেন। চন্ডী কমলে কামিনী রূপ দেখান, ধর্ম পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় করতে পারেন। মনসা মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে দেন। আরও নানা ধরণের প্রচলিত

বৈশিষ্ট্যের কথা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। নায়িকার বারমাসী নারীগণের পতিনিন্দা, রন্ধনপ্রণালী, বিবাহের লোকাচার ইত্যাদি তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এসব মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠলেও তার প্রাণকেন্দ্র নয়। মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের পর তার রূপ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তখন থেকে প্রথাসিদ্ধভাবেই এই কাব্যগুলি রচিত হতে থাকে। তখন আর কাহিনী বা চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাওয়া যায় না। এই কারণে দীনেশচন্দ্র সেন মঙ্গলকাব্যগুলিকে পুচ্ছানুসারিতার অপবাদ দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের গঠন প্রণালীতে এই গতানুগতিকতার দুটি কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম, কারণ প্রথানুগত্যরক্ষা আর দ্বিতীয় কারণ, উদ্ভাবনীশক্তির অল্পতা। মঙ্গলকাব্যের কবিরা একটি দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে লোকসমাজে তাঁর পূজা প্রচার করেছেন। সে ক্ষেত্রে পূজা পদ্ধতি ও দেবীর প্রকৃতি পরিচায়ক বিশেষ ধরণের আখ্যানই তাঁরা অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। পূজা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে একটা বিশেষ ঐতিহ্যের অনুসরণই করা হয়। এই ঐতিহ্য অনুসরণ না করলে পূজার অঙ্গহানি ঘটবে এবং দেবী অসন্তুষ্ট হবেন এই লোক বিশ্বাস। দেবতার রোষে ঐহিক ক্ষতিও হওয়া সম্ভব। তান্ত্রিক দেবী পূজার ক্ষেত্রে কিছু আচরণীয় বিষয়ের নির্দেশ থাকে। সেগুলি লোকসমাজ পালন করে। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা যেরূপ খেয়ালী ও ক্রোধী তাতে তাঁর সম্বন্ধে নূতন ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হলে তা দেবদেবীর প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে; তাতে দেবী ক্রুদ্ধও হতে পারেন। এই সব কারণে মঙ্গলকাব্যগুলি একবার গড়ে ওঠা ঐতিহ্যকেই অনুকরণ করে গেছে। যে কোন দেবদেবীর পূজার আচারের মতো তাঁর আখ্যানগুলিও সমান ঐতিহ্যবাহিত। কবিরা নূতন কাহিনী যোজনা করে আখ্যানটির কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে পরিবর্তিত করেন নি। সম্প্রদায়গত উপাসনা পদ্ধতি ও আখ্যান অবলম্বন করেই দেবদেবীর গীতরচনার কাজ করে গেছেন। কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহিত কাহিনীক্রমের মধ্যেও আছে কিছু স্বাতন্ত্র্যের বীজ। স্থান ও কালভেদে তা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের আরোপ করেছে। সেই স্বাতন্ত্র্যগুলি অবশ্য সমগ্র কাব্যের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দিতে পারে নি — বাইরের কাঠামো তার একই আছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদের কবিত্ব ছিল কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি বেশি ছিল না। তাই এই স্বাতন্ত্র্যও বেশিদূর যেতে পারে নি। কবিরা প্রচলিত আখ্যানকে অবলম্বন করেই তাঁদের কবিত্বের উন্মোচন করেছেন। এই কারণে মঙ্গলকাব্যগুলিতে আখ্যান বর্ণনার একটা প্রথাসিদ্ধ রূপ গড়ে উঠেছিল। তাকেই দীর্ঘকাল অনুসরণ করা হয়েছে।

৩

আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন বাংলার লৌকিকধর্মের উপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করা মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল।[১২] তিনি অন্যত্র আবার বলেছেন যে উদ্দেশ্যে সংস্কৃত পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যগুলিও অনেকটা সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয়।[১৩] কিন্তু বাংলার লৌকিক

ধর্মকে অবলম্বন করেই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে এই বিষয়ের মৌল লৌকিকতার আলোচনা করেছেন।

> আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্য মঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। এই সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়।[৪]

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ পরবর্তী যুগের সমাজের আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে নূতন দেবদেবীর উদ্ভবের ইতিহাস সন্ধান করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন দেবতাদের দ্বন্দ্বের মূলে নিহিত ছিল ভারতবর্ষের নানা জাতির ইতিহাসের ভিতরকার দ্বন্দ্ব।[৫] রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দেবদ্বন্দ্বের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিচয় পরিস্ফুট হয়। বৈদিক দেবতাদের ক্রমক্ষীয়মানতা, পৌরাণিক দেবতাদের প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমে পৌরাণিক শিবের উপরে লৌকিক শক্তির অধিকার বিস্তার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা — এই আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসের বিশিষ্ট প্রবণতা। এই প্রবণতা নানারূপে প্রকটিত হয়। বৈদিক বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎগণ বা অশ্বিরা এখন আর পূজিত হন না। পৌরাণিক বিষ্ণু এবং তাঁরই নানা অবতার — বিশেষত রাম ও কৃষ্ণ এখন ভারতবর্ষের দেবধর্মের দুই প্রধান রূপ। শিব পৌরাণিক দেবতা। কিন্তু তিনি হয়তো আদৌ আর্যসমাজের দেবতা ছিলেন না। দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শিব সম্ভবত অনার্যসম্ভূত বলে দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন নি। তাই তিনি শক্তির দ্বারা আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করেছিলেন। ভারত ইতিহাসের বিশিষ্ট সমন্বয়ী প্রবণতার ফলেই দেবদেবীদের গ্রহণবর্জনে একটি দেববাদ গড়ে ওঠে। পুরাণগুলিতে যে শিবকে পাই তার বাইরে লৌকিক শিবের একটিরূপ প্রচলিত আছে। তার ফলে বাংলাদেশে প্রচলিত শিব একাধারে কৃষকরূপী আবার পৌরাণিক চরিত্রের ধর্মেও বিশিষ্ট। একদা শিব বাংলার লোকসমাজে দেবতা ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে যখন মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলেন তখন এই পৌরাণিক শিবমূর্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে হল। এইভাবে মনসা, চন্ডী বা ধর্ম বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। একবার এই লৌকিক দেবদেবী সমাজে গৃহীত হবার পর তাঁর পৌরাণিকীকরণ করা হল। এই কারণেই আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন লৌকিক দেবদেবীর পৌরাণিকীকরণ প্রক্রিয়ায় মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। যখন এই লৌকিক দেবদেবী সমাজে পূজিত হতে শুরু করে তখনই পৌরাণিক মহিমা দিয়ে তাঁকে হিন্দু ধর্মতত্ত্বে গ্রহণ করে নেওয়া হল। ভারতীয় চেতনার একটি ধর্ম যুগপৎ তার কেন্দ্রীয় ঐক্য রক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তিকে স্বীকার করা। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীরা একবার কোন উপায়ে বা শক্তিতে সমাজে পূজিত হবার পর সেই সমাজের ধর্মচেতনার অবিচ্ছিন্ন একটি অঙ্গ হয়ে পড়লেন। এইভাবে মনসা শৈবশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হিন্দু সমাজে গৃহীত হন। তখন শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি শিবের কন্যারূপে স্বীকৃত হন। এইভাবে প্রচলিত দেবতাদের জায়গায় নূতন শক্তি

প্রতিষ্ঠালাভ করে। একবার গৃহীত হবার পর বিশেষ ধর্মীয় শৃঙ্খলায় তাঁর আত্মীকরণ হয়। প্রত্যেক ধর্ম গোষ্ঠীরই নিজস্ব শৃঙ্খলা 'a device suited to expressing its identity'[১৬] থাকে। মনসা একবার হিন্দুধর্মে দেবী হিসেবে গৃহীত হবার পর হিন্দু পুরাণে তাঁর মহিমা পৌরাণিক শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪

মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দিক থেকে দেখলে বলা যায় সর্পপূজা অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। তিনি 'আদিম গ্রাম গোষ্ঠীর ভয়ভক্তির দেবতা'[১৭] রূপে দীর্ঘকাল পূজা পেয়ে আসছেন। সর্পপূজার আদিরূপে পাই একটি সর্প বা সর্পজাতির পূজা। তারপর শুরু হয় সর্পের অধিষ্ঠাত্রী রূপে কোনো দেবীর পূজা। স্বর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে মনসার পূজা পালযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃত হয়।[১৮] তার আগে তিনি লৌকিক দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আসছিলেন। নতুবা ব্রাহ্মণ্যধর্মে তাঁর স্বীকৃতি সম্ভব হত না।

ভারতে সর্পপূজার উদ্ভব সম্বন্ধে পন্ডিতেরা নানা কথা বলেন। একদল মনে করেন মধ্য এশিয়ার কোনো জাতিসর্পপূজা এদেশে এনেছে। আবার কেউ কেউ এরকমও মনে করেন যে সর্পপূজা স্বাধীনভাবেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। ভারতের আদি সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়ো হরোপ্পার সিলমোহর থেকে এদেশে সর্পপূজার প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পশুপতি সিল-এ সর্পচিত্র দেখে মনে হয় সর্প সেই সময় থেকেই শৈব সাধনার আদি পর্বের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অবশ্য নাগ এবং সাপের প্রচুর কাহিনী আছে। মনে করা হয় প্রাচীনভারতে একদল মানুষ সর্পকে totem হিসেবে ব্যবহার করত। তারাই নাগ জাতি। তারা সাপের ফণাকে নিজেদের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহার করত।

ঋগ্বেদে সর্পপূজার উল্লেখ নেই। এই কারণে Ferguson এদেশে আর্যজাতির সর্প উপাসনা স্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর এই মত গৃহীত হয় নি। এদেশে আদিম অধিবাসীদের সর্পপূজা আর্যরাও গ্রহণ করেছিলেন। অথর্ববেদে এবং গৃহ্যসূত্রে সর্পপ্রসাদনের কাহিনী এবং মন্ত্র আছে। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — "various snake Gods one the mentioned by name in the Atharva Veda indifferent content.[১৯] অথর্ববেদে এবং গৃহ্যসূত্রে সর্পপ্রসাদনের প্রথা দেখে মনে হয় ক্রমে আর্যরা এই সর্প cult স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ক্রমে ক্রমে সর্পপূজা নানাধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। শিবের সঙ্গে অবশ্য সাপের যোগ অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। তাই শিবের আর এক নাম নাগভূষণ। আবার বিষ্ণুর অনন্তশয্যার সাপের সঙ্গে যোগ লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাগ বা সর্পের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। জৈনদের শাস্ত্রে মহোরগকে ব্যান্তর দেবতারূপে পূজা করা হোত।[২০] বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক নাগ প্রধানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২১] V.A.

Smith বলেন প্রথম যুগে বৌদ্ধরা জলের নাগদের পূজা করত। নাগের সঙ্গে সর্পকাল্টের যোগ থাকা সম্ভব। মথুরায় প্রাপ্ত একটি স্মৃতিকে মনসা মনে করা হয়েছে। এটি আসলে যক্ষীমূর্তি।[২২]

জলের সঙ্গে যেমন তেমনি গাছের সঙ্গেও সাপের যোগ অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। বৃক্ষপূজা এদেশে অতিশয় প্রাচীনপ্রথা। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন এটি আদিম কৃষি ও প্রজনন শক্তির পূজা। আদিবাসীদের সংস্কৃতি থেকে আমরা এটি গ্রহণ করেছি। সর্পের সঙ্গে এই বৃক্ষপূজার সংযোগের কারণ হিসেবে দুটি ধারণা কাজ করেছে। প্রথমতঃ বৃক্ষের পবিত্রতার ধারণা। দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষে সর্পের অধিষ্ঠান। বৌদ্ধরা বৃক্ষদেবতাকে নাগরূপে পূজা করে। দক্ষিণ ভারতে অনেক গাছের নীচে সর্পচিহ্নিত পাথর রাখা হয়।[২৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের যোগের কারণ উভয়েই উর্বরতা বাদের প্রতীক।[২৪] তাছাড়া কেউ কেউ মনে করেন "Snakes were worshiped as tree spirit."[২৫] যে কারণেই হোক বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের যোগ ঘটেছিল। তারপর বৃক্ষ নিবাসিনী হিসেবে সর্পসত্তা দেবীর পূজা শুরু হয়। ক্রমে অন্যান্য গাছের মধ্যে স্নুহী বা সীজ গাছ মনসার অধিষ্ঠানরূপে পবিত্র বৃক্ষে পরিণত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন স্নুহী গাছের সর্প বিষনাশক শক্তি কল্পনাতেই এই বৃক্ষে মনসার অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। বাংলাদেশে এই সীজগাছকে মনসা গাছও বলা হয়। মনসার বাসক্ষেত্র হবার জন্যই এরকম নামকরণ। এইভাবে জীবন্ত সর্পপূজা[২৬] থেকে বিশেষ একটি গাছে সর্পের অধিষ্ঠান বিবেচনা করে পূজা শুরু হয়। অতপর স্নুহীবৃক্ষই মনসার অবস্থান হেতু মনসা গাছ নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। আশুতোষবাবু বলেছেন সীজগাছে মনসাপূজা আমাদের সংস্কৃতিতে বোড়ো জাতির দান।[২৭] সে যাই হোক, এ হল প্রত্যক্ষ সর্পপূজা থেকে প্রতীক পূজার দিকে যাত্রা। সীজ বৃক্ষে পূজা প্রত্যক্ষ সর্পপূজা থেকে সর্পসত্ত্বা দেবী পূজার দিকে যাত্রার মধ্যবর্তীস্তর। এর মাঝের স্তর সর্পমূর্তির খোদিত চিত্রের পূজা।[২৮] সর্পপূজার সরীসৃপ মূর্তি থেকে ক্রমে নরনারী মূর্তিতে যে পরিবর্তন ঘটে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে প্রত্যক্ষ সর্পপূজা থেকে সর্পসত্ত্বাদেবী পূজার প্রচলন ঘটল তা বলা যায় না। আদিম জাতিগুলির চিন্তা পদ্ধতির পরিণতির ফলে এমন হতে পারে। অথবা কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর নরাকৃতি দেবদেবীর পূজারীতির প্রভাবেও এমন হওয়া সম্ভব। পৌরাণিক যুগে যখন আর্যসমাজের নৈসর্গিক দেবদেবী নরনারীর আকৃতিলাভ করেন তখনই এই সব আর্যসমাজ বহির্ভূত দেবদেবী নরাকৃতি লাভ করেন। আশুতোষবাবুর এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করতেই হয়। সেইজন্য সর্পমূর্তির পরিবর্তে ক্রমে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী নারীরূপের পূজা শুরু হয়।[২৯] সেইভাবে দেবীকল্পনারও প্রচলন ঘটে। বাঙালীর মিশ্র জাতিতত্ত্বে যে বহুজনগোষ্ঠীর মিশ্রণ হয়েছিল তার ধর্মকর্মে তারই প্রতিফলন ঘটে। আশুতোষ ভট্টাচার্য সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আর্যপূর্ব জনগণের ধর্ম বিশ্বাসের আভাস আছে।[৩০] "বাংলার প্রাচীনতম দেব পরিকল্পনাও এদেশের প্রাগৈতিহাসিক আদিম সমাজেরই এই প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত।"[৩১]

তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে বাঙালীর জীবনে একটা নূতন পর্যায় এসেছিল। বাঙালী ইতিপূর্বে আর্য চেতনার সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে চলছিল। যখন তুর্কী আক্রমণ হল তখন একটি ভিন্ন সংস্কৃতির স্পর্শ সে লাভ করল। এতদিন দুই সংস্কৃতির মধ্যে কেবল দান ও গ্রহণের সম্পর্ক ছিল কিন্তু দুয়ের যোগাযোগ তেমন গভীর ছিল না। তুর্কী আক্রমণ এই দুয়ের যোগকে অনেক গভীর করে। ''নবীন ও প্রবীণের সংস্কৃতিগত ধর্ম বিশ্বাসগত আচার ব্যবহারগত ও ভাবধারাগত দুস্তর ভেদ''[৩২] ঘুচিয়ে একটি অখন্ড সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে তুর্কী আক্রমণ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পর্বে লৌকিক স্তরের দেবদেবী উপরের স্তরে উঠে আসে এবং সমাজের বৃহত্তর জনগণের সমর্থন লাভ করে। এই ভাবে সর্পপূজা ও সর্পদেবী মনসা পূজার প্রচলনের পিছনে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ভূমিকার ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

৬

বাংলায় মনসাপূজা এক অর্থে অভিনব। তার ইতিবৃত্ত রচনা করাও দুরূহ। তবে একথা বলা যায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাসের স্তরীভূত বিন্যাসের একটা ভূমিকা এর পিছনে আছে।[৩৩] ইতিপূর্বে পুরাণ বা মহাভারতে আমরা যে নাগমূর্তির কথা পেয়েছি তারা সবাই পুরুষ দেবতা। কিন্তু মনসামঙ্গলে মনসা নারী। মনসা দেবীর সর্পবিষনাশের যে শক্তি আছে তাঁদের তা নেই। আবার মনসামঙ্গলে বিষবৈদ্য ধন্বন্তরী পুরুষ, সুতরাং বাংলার মনসা এই দুই অর্থেই অভিনব। মহাভারতে আমরা সর্পমাতা কদ্রুর কথা পাই। তিনি কশ্যপের স্ত্রী এবং সর্পমাতা। অন্যপক্ষে বাংলা মঙ্গলকব্যের মনসা সর্পমাতা নন, তিনি আস্তীক জননী। এই দেবী কীভাবে বাংলায় আবির্ভূত হলেন তা বলা শক্ত। তবে মনে হয় আর্য সমাজের বাইরে কোনো জনগোষ্ঠীর দেবতা হিসেবে তিনি উদ্ভূত হন। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, মনসা কোনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই উদ্ভূত হয়েছিলেন — আমাদের প্রতিবেশী জাতিগুলির মধ্যেই সর্পপূজার ও সর্পদেবীর প্রথম উন্মেষ হয়। এই প্রসঙ্গে মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর কথা মনে আসে। মোঙ্গলীয় জাতির মধ্যে নাগ সংস্কৃতির উৎস সন্ধান করা হয়ে থাকে।[৩৪] মনসা এই সমাজের দেবতা হতে পারেন। T.W. Clark তাঁকে কোন Semi nomadic tribe দের দেবতা বলে মনে করেছিলেন। আশুতোষ বাবু মনসা দেবী পরিকল্পনায় বাংলার প্রতিবেশী গারো কিংবা খাসিয়া জাতির মতো এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির অবদানের কথা স্মরণ করেছেন।[৩৫] আগেই সুহীবৃক্ষে মনসা পূজার ক্ষেত্রে বোড়ো জাতির অবদানের কথা স্মরণ করা হয়েছে। আর্য সমাজের বাইরে এই মোঙ্গল জাতির মধ্যে উদ্ভূত এরকম এক কিরাত কন্যার কথা অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এই নারী সর্প বিষ চিকিৎসায় পারঙ্গম; তিনি সর্পদংশনের প্রতিকার করতে পারেন। সুতরাং প্রাচীন অথর্ববেদের দৃষ্টান্ত থেকে বলা সম্ভব এই কিরাত কন্যার ধারণা মনসা ধারণার পূর্বরূপ। তবে সর্প উপাসক দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে ও এই কিরাত জাতির একটি সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সেই

কারণে দক্ষিণ ভারতের সর্পপূজার স্মৃতি এই কিরাত জাতির সর্পপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের যুক্তিক্রম অনুসরণ করে বলা যায় এই কিরাত কন্যা বা কিরাতদের সর্পবিষ চিকিৎসা পারঙ্গম রমণীদেরই কেউ বৌদ্ধ শাস্ত্রেও গৃহীত হন। তার বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত নাম জাঙ্গুলী। মহাযান বৌদ্ধধর্মে জাঙ্গুলী সর্পদেবী। জাঙ্গুলী শব্দের অর্থ জঙ্গলের মানুষ বা জঙ্গলে জাত। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রথম বলেছিলেন হিন্দু দেবী মনসার সঙ্গে জাঙ্গুলীর সাদৃশ্য আছে।[৩৬] তিনি আরো বলেন "Janguli appears to have been a divinity of the aboriginal tribes of India and was given a shape and admitted into the Buddhist Pantheon in a fairly early period."[৩৭] আরণ্যক জাতিগোষ্ঠীর দেবী হিসেবে তিনি প্রথমে পূজিত হতেন। পরে বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হন। এবং এই বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী ক্রমে হিন্দুসমাজে গৃহীত হন। এই ক্রমে অনার্য গোষ্ঠীর সর্প দেবীরূপে গৃহীত হবার পর হিন্দু সমাজে দেবতা রূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

৭

দেবীর নাম মনসা কেন এ নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন প্রথম বলেছিলেন দক্ষিণ ভারতের 'মঞ্চামা' থেকে বাংলায় মনসা কথাটি এসেছে। শব্দটি বাংলায় সামান্য ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে মনসা রূপে প্রচলিত হয়েছে। তিনি দক্ষিণভারতের অম্বাভারুর কাহিনীর সঙ্গে মনসা কথার সাদৃশ্য দেখিয়ে এই মত দিয়েছিলেন। নলিনী কান্ত ভট্টশালী এবং নীহাররঞ্জন রায় তাঁর যুক্তি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সুকুমার সেন এই মত স্বীকার করেন নি। বস্তুত সুকুমার বাবু বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে এবং ব্যাকরণে মনসা নামটির সন্ধান করে একে বৈদিক দেবতা বলে প্রমাণ করতে চান। তিনি বলেছেন রুদ্রের ক্রোধ মনা থেকে মনসার সৃষ্টি। তাছাড়া তিনি চন্দ্রগোমীয় ব্যাকরণে শব্দটি পেয়েছেন। "Manasa devi the full form of the name of Goddess is cited by Chandrogomin"[৩৮] উপরন্তু ষষ্ঠ শতকে উত্তরভারতের প্রান্ত অঞ্চলে মনসা নামে প্রচলিত ছিল বলে তিনি এক বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রমাণ থেকে দেখিয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য মঞ্চামার সঙ্গে মনসার সাদৃশ্যকে আকস্মিক বলে মনে করেন।[৩৯] তিনি বরং পাঞ্জাবের 'মনসা' কিংবা উত্তরপ্রদেশের 'মনসা' দেবীর মন্দিরের নানা যুক্তিতে এই সব অঞ্চল থেকে নামটি আমদানী করবার পক্ষপাতী। তিনি লিখেছেন পশ্চিমভারত থেকে সাঁপুড়েদের মধ্যস্থতায় মনসা নামটি বাংলায় এসেছে। এবং ক্রমে পাল বর্মন সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যখন হ্রাস পাচ্ছিল তখন তা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে মনসারূপে স্বীকৃত হয়। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন সেন আমলে মনসা পূজা এদেশে বেশী প্রচলিত হয়। আমরা একাদশ শতকের একটি মূর্তি পেয়েছি যাতে বিজয় সেনের নাম আছে। ইনি যে বাংলার রাজা বিজয় সেন তা স্থির হয়েছে। মূর্তিটিও মনসার। সুতরাং সহজ যুক্তিতে মনে হয় সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় মনসা দেবীর পূজা বিস্তার লাভ করে। তাঁদের আনুকূল্যে নানা লৌকিক দেবদেবীও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে মনসা পূজা জনপ্রিয় হয়। যদি এই শতকে আরও কিছুটা পিছিয়ে নেওয়া যায় তাহলে বলা চলে অন্তত ত্রয়োদশ শতকে মনসা পূজা বাংলার লোকসমাজ থেকে উচ্চতর সমাজে প্রচলিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে প্রচারিত বৌদ্ধ দেবী বা জৈন দেবী ধর্মীয় ক্ষীয়মানতার যুগে ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন। অন্যপক্ষে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুনরভ্যুত্থানের যুগে তাঁরা হিন্দু দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উত্থান অবশ্য বেশ কিছু আগে থেকেই হয়েছে। নীহাররঞ্জন বলেন, সেনবর্মন বংশের কালে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। এই সময় জৈনধর্মের চিহ্ন প্রায় নেই বৌদ্ধদের দেবীর মূর্তিবিরল[৪০] সম্ভবত এই পর্বে লৌকিক মনসা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে গৃহীত হয়েছেন। সেন রাজাদের কাল ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোনো সময় তাঁরা তুর্কিদের হাতে পরাজিত হন। ফলে বলা যায় অন্তত দ্বাদশ শতকে বাংলা দেশে এই পূজা প্রচারিত হয়েছিল।

৮

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ত্রদেশে তুর্কী আক্রমণ হয়। তুর্কী আক্রমণ এমন একটি প্রচন্ডতা নিয়ে আসে যার ফলে ত্রদেশে এতদিনকার সামাজিক গতি পথটিই বদলে যায়। এ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের গতি ছিল আর্যীকরণের দিকে। নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা থেকে দেখা যায় পাল যুগ থেকেই এই অভিমুখিতা ছিল। পালযুগের লিপিমালা থেকে তিনি দেখাচ্ছেন এই প্রবণতা সেখানে বিদ্যমান। তারপর সেনবর্মন যুগে তার গতি সমানই ছিল কিন্তু তার বিস্তার হয়েছিল অনেক বেশী। কিন্তু তুর্কি আক্রমণের ফলে সেই ধারাটিই অন্তত সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল। ইতিপূর্বেই উত্তর ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একজন গবেষক সেই মুসলমান আক্রমণকে এদেশের আর্যাবর্তচেতনার উপর আঘাত বলে মনে করেছেন।[৪১] এর ফলে ভারতীয় নীতি এবং ধর্মচেতনার উপর যে প্রচন্ড প্রভাব পড়ে তার কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাংলাদেশের পক্ষে তুর্কি আক্রমনের ফল কিছু গুরুতর হয়েছিল। বাংলাদেশের সেন রাজাদের সহায়তায় এখানে যে ব্রাহ্মণ্যশাসন সমাজ বিন্যাসকে একটা রূপ দিচ্ছিল এই আঘাতের ফলে তা ভেঙে পড়ে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিন্যাসের রূপটি কতোটা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর পক্ষেও সুখকর হয়েছিল বলা দুষ্কর। যতটা জানা যায় এই সময় বৌদ্ধদের উপর নানা দিক থেকে সামাজিক চাপ চলছিল। বৌদ্ধ পাষণ্ডীদের উপর প্রবলভাবে তান্ত্রিক আক্রমণ করছিলেন ভট্টভবদেব। কোথাও কোথাও বৌদ্ধ মঠ বা বিহারও হিন্দু সৈন্যরা ভেঙে ফেলছিল। সমাজের নিম্নবর্গের পক্ষেও এই ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা খুব সুখকর হয়েছিল এমন বলা যায় না। চর্যাপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিশেষ গ্রাহ্য হয় নি। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে এই সময় সমাজের শ্রেণীগুলিকে সংহিতায় নির্দিষ্টভাবে রূপবদ্ধ করবার কাজ হচ্ছিল। ফলে সমাজ নির্দিষ্ট শ্রেণী হিসেবে প্রত্যেক জাতির স্থান নিরূপিত হয়ে যাচ্ছিল। সমাজে চলাচল প্রথা প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সমাজে কৌলিন্য প্রথার

প্রবর্তন, সামাজিক শাস্তির নানা প্রথার আরোপ এসব সমাজকে ব্রাহ্মণ্য শাসনে বেধে রাখার বিশেষ অভিপ্রায় থেকে শুরু হয়েছিল। মনে হয় অতিরিক্ত তন্ত্রাচার এবং তন্ত্রের বিবিধ বিকার এগুলির মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। সে যাইহোক ব্রাহ্মণ্য শাসন ব্যবস্থায় সমাজ পরিচালিত হবার ফলে নিম্নবর্গের উপর তার প্রতিক্রিয়া সব সময় ভালো হয় নি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সে সময় বৌদ্ধদেরও নিম্নবর্গের হিন্দুদেরকে নিকৃষ্ট জীব বলেই গণ্য করত।[৪২] উপরন্তু ব্রাহ্মণ সমাজেও দেখা দিয়েছিল নানাবিধ অত্যাচার। উপরন্তু লক্ষণ সেনের আমলে সমাজে রাজা ও রাজপুরুষদের নানাবিধ অনাচার জনসাধারণের জীবনকে অনেক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। "সেখশুভোদয়া" গ্রন্থে লক্ষণ সেনের রানী বল্লভার ভাই এর নানা অনাচার রানীর ভাইকে সমর্থন - এসব কাহিনী তখনকার সমাজে বলবানদের অত্যাচারেরই পরিচয় দেয়। রাজ সভায় রচিত কাব্যগুলির মূল বিষয় যে দেহগত প্রণয় তারও ইঙ্গিত এই সমাজগত নীতি দুষ্টতার দিকে। অর্থাৎ একদিকে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের দৃঢ় শাসনপাশে সমাজকে আবদ্ধ করার চেষ্টা আবার সেই সমাজেই বলবানদের অনাচার, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভিতরেই অবক্ষয়ের নানা রূপ - এই সবই সেকালের সমাজ দুর্বলতার পরিচায়ক। "ধর্মপূজাবিধান"-এ নিরঞ্জনের রুন্মায় ব্রাহ্মণদের উপর যে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে তার ইঙ্গিতও গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে দেখি ব্রহ্মা বিষ্ণুই মুসলমান বেশে হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করেছে।

ব্রহ্মা হৈল মোহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগম্বর
আদম হৈল শূলপাণি
গনেশ হৈল গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজী
ফকির হইল্যা যত মুনি।...
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর
দেউল দেহারা ভাঙে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাথর বোলে বোল।

এই কবিতাটিতে সে যুগের ব্রাহ্মণেতরবর্গের জনসাধারণের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা বলা যায়। সেকালের ক্লিষ্ট নির্যাতিত মানুষেরা যে জীবনযাপন করেছিল তার হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় তারা পেয়েছিল এই তুর্কী অভিযানে। তারা তুর্কী অভিযানকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেছিল।

> ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের ফলে বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের জনসাধারণ খুবই ক্লিষ্ট ও নির্যাতিত জীবন যাপন করেছিল ও তারা নিষ্কৃতির জন্যে ঐশী শক্তির কাছে প্রার্থনা করছিল এবং সে সময় বাংলায় মুসলমান বিজয়াভিযান হলে তারা বেশ সমাদরের সঙ্গেই বৈকুণ্ঠ থেকে অবতীর্ণ পরিত্রাতা রূপে মুসলমানদের বরণ করেছিল।[৪৩]

এ বিষয়ে অনুরূপমত আরও অনেক উদ্ধৃত করা সম্ভব।

> নিম্নবর্ণের সমাজে কিন্তু হিন্দুর সমাজদর্শ সুদৃঢ় অবরোধ রচনা করিতে পারে নাই। বৌদ্ধগণ হিন্দু সমাজে নিগৃহীত হইতেন। ফলে সমাজের এই অন্ধকার প্রদেশে ইসলামের বাণীপ্রচার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল...[৪৪]

> অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অনুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না।[৪৫]

— এই দিক থেকে বলা যায় নিম্নবর্গের পক্ষে মুসলমান অভিযান তখন একটা স্বস্তিরূপে দেখা দিয়েছিল। বাংলায় যে ব্রাহ্মণ্যশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এ তার থেকে সমাজকে মুক্ত করে। তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়। আমরা আগে উল্লেখ করেছি - সুকুমার সেনের মত — যেখানে তিনি বলেছেন — তুর্কি আক্রমণ বাংলার দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা সংযোগ সাধন করেছিল। সে কথা আবার স্মরণ করা যায়। এতদিন সমাজের দুই স্তর সমান্তরাল ভাবে চলেছিল। তার হয়তো একটা প্রবনতা ছিল নিম্নবর্গের কিছু ব্রাহ্মণ্য শাসন স্বীকার করা মানুষকে উচ্চবর্ণের সমাজকাঠামোর মধ্যে গ্রহণ করা। তার ফলে কিছু কিছু নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই সমাজ কাঠামোয় স্থান পাচ্ছিল। কিন্তু নিচের তলার মানুষের জীবনের নিজস্ব প্রকাশ কিছু স্বীকৃত ছিল না। এতদিন উপরতলার প্রকাশের ভাষাও ছিল আলাদা — লোকভাষা থেকে তা স্বতন্ত্র এবং আভিজাত্যপূর্ণ-সংস্কৃত ভাষা। এবার তুর্কি আক্রমণে পুরানো রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে গেল রাজা হয়ে দেশ শাসন করতে বসলেন যাঁরা তারা হলেন অন্য ভাষাভাষী মানুষ। ফলে সংস্কৃত ভাষার এতদিনকার Privilege এবার ভেঙে পড়ল। সুতরাং যেমন জাতিগত দিক থেকে বাঙালীকে - দুই স্তরে বিভক্ত জাতিকে বাইরের দিক থেকে প্রচন্ড আঘাত দিয়ে একটা মেলাবার জায়গায় এনে দিল তেমনি ভাষাগত দিক থেকেও মানুষের মুখের কথ্যভাষার মূল্য স্বীকৃত হল। সুতরাং তুর্কী আক্রমণ বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একথা ঠিক তুর্কী আক্রমণে প্রথমত এ দেশের ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের সমাজ বহুভাবে অপদস্থ ও অত্যাচারিত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে সেই আঘাত সমাজের নিচের তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতেও পারে। আসলে বিদেশী শক্তির পক্ষে রাজ্যশাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রথমেই কিছু অনুগতলোক তৈরী করার প্রয়োজন হয়। তার সঙ্গে ইসলামের ধর্মপ্রচার নীতি যোগ হয়ে যাবার ফলে অভিঘাতটি প্রবলতা পায়। এর ফলে বহুক্ষেত্রে অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বহু মানুষ ধর্মত্যাগ করে প্রাণরক্ষা করেন। বিদ্যাপতির কীর্তিলতা থেকে তুর্কীর অত্যাচারের কাহিনী প্রায় সকলেই উদ্ধৃত করেন। তা থেকে দেখা যায় তখন কি পরিমাণ

অত্যাচার চলেছিল।

তুরুক-তোখারহিঁ চলল হাট ভমি ফেড়া মাঙ্গই,
আড়ী দীঠি নিহারি দবলি দাঢ়ী থুক বাহ-ই।[৪৬]

তুর্কী আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আর্যীকরণের বা ব্রাহ্মণীকরণের উপর আঘাত। এরই কারণে - বাংলার সমাজে যে ব্রাহ্মণীকরণ প্রক্রিয়া চলেছিল তা রূদ্ধ হল। ব্রাহ্মণ সমাজ এই বিধর্মীদের পীড়ণে সাময়িকভাবে হীনবল হয়ে পড়লেন। ফলে সমাজে এই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবর্তনার ধারায় ছেদ পড়ল। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ যে প্রসরণশীলতায় ব্যাপ্ত হচ্ছিল তাও আপাতত স্তব্ধ হল। যেমন উত্তরাপথের সঙ্গে যোগের দ্বারা বাংলাদেশ সংস্কৃত হচ্ছিল তেমনি কিছুটা হলেও সমাজে তার ব্যাপ্তি ঘটছিল । এখন সমাজে বিধিবিধান আরও কাঠোর হতে লাগল। স্মৃতি শাস্ত্রের প্রভাবে সমাজ পরিচালিত হল।

ইসলামের আঘাতে পরাভূত জাতির মধ্যে নিজেকে *"দুর্ভেদ্য সামাজিক নির্মোকে"*[৪৭] গুটিয়ে দেবার কাজ এই সময় শুরু হল। ব্রাহ্মণদেরও পক্ষে বেশ কিছু কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করা হল। ব্রাহ্মণদের পক্ষেও সদাচার পালনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। ধর্মের বিধান কঠিন হল। অন্যদিকে বাইরের অত্যাচারের প্রতি বিধান করার উপায় যখন নিজের শক্তিতে সম্ভব হল না তখন দৈবশক্তিই ভরসা হিসেবে দেখা দিল। তারই ফলে এতদিনকার অবজ্ঞাত লোকধর্মের দেবদেবীর দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ল। এমনও সম্ভব অত্যাচারিতের কল্পনায় প্রতিশোধ গ্রহণকারী শক্তিরূপে যে রকম দেবতার প্রয়োজন দেখা দেয় - এই দেবদেবী অনেকটা সেই প্রয়োজনেই প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে মনসা সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়। সমাজে বহুদিক থেকেই নাগিনীদেবীর পূজা কোনো বিশেষ নামে প্রচারিত থাকলেও তাঁর উপরে কোনো প্রতীকী গুরুত্ব আরোপ হয় নি। এতদিনকার লোকদেবতা লৌকিক স্তরেই পূজিত হয়ে আসছিলেন। এমনও সম্ভব তাঁর একটি ব্রতকথাও প্রচলিত ছিল। তিনি কোনো নামে অর্চিত হচ্ছিলেন। কিন্তু এতদিন তিনি সমাজের লৌকিক স্তরে পূজিত হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণের দেবতা হিসেবে গৃহীত হন নি। এবার বিদেশী শাসক কুলের প্রবল চাপে উচ্চবর্ণের সমাজ আর নিম্নবর্ণের সমাজ অনেকটা কাছাকাছি আসে। এর ফলে উচ্চবর্ণের সমাজে এই দেবীর প্রবেশাধিকার ঘটে। এমনও সম্ভব উচ্চবর্ণের সমাজ এই শক্তিময়ী দেবীর মধ্যে নিজের দুর্বলতা দূর করে একটা কল্পিত শক্তির আস্বাদ লাভ করে। হাসান হোসেন পালার মধ্যে সেই ইঙ্গিত থাকা সম্ভব। মনসামঙ্গলের দেবীর উপর এবার সমাজের ইচ্ছার আরোপে তার প্রতীকীমূল্য পরিবর্তিত হয়ে পড়াও অসম্ভব ছিল না।

আসলে মুসলমান আক্রমণের ফলে বিজিত হিন্দুর মধ্যে দুরকম প্রতিক্রিয়া হল। প্রথমত উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে দেখা দিল বিধি বিধানের কঠোরতা। তাদের মধ্যে দেখা দিল কমঠবৃত্তি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা। জগৎ থেকে তারা নিজের চর্চার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আর বিশেষ করে যারা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ

তাদের একাংশ ধর্মান্তরিত হল। কিন্তু আরেকটি অংশে রয়ে গেল নিজস্ব ধর্ম, ও দেশজ আচারের উপর নির্ভরতা। এই অংশে আছে নারী ও নিম্নবর্গের মানুষ। তারা লোকাচার ও লৌকিক ধর্মসংস্কৃতির ধারক। লৌকিক দেবীকে অবলম্বন করে দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে তারা আত্মরক্ষার উপায় খুঁজল। এই কারণেই সম্ভবত শিব গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন মনসা চন্ডীর মত লৌকিক দেবীরা প্রধান হয়ে পড়লেন।

অবশ্য এই বহুপ্রচলিত মতটির সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবার উপায় নেই। মনসামঙ্গলের দেবীর মৌল প্রকৃতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বলেও মনে হয়। এমনটি হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়। অন্তত আমরা সমাজের যে গতি দেখেছি তাতে অনেক লৌকিক দেবদেবীই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়ে আসছিলেন। সুতরাং একথা স্বীকার করা যায় যে মনসার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবেই উচ্চবর্ণের পূজালাভ ঘটেছিল।

৯

মনসামঙ্গলের কাহিনী বিচার করলে দেখা যায় মনসাপূজা চারটি স্তরে ক্রমশ প্রচলিত হয়েছে। প্রথমে দেখা যায় রাখালদের মধ্যে মনসা পূজা প্রচলিত হয়। রাখালেরা প্রথম মনসাদেবীকে পূজা করে। অনুমান করা যায় যে সময় পথঘাট ছিল সাপে পরিপূর্ণ - গোচারণে গোরু এবং মানুষ দুই-ই সাপের দংশনে মারা যেত - সেই সময় কোনো দেবী সর্পের নিয়ন্ত্রণকারী সর্প বিষনাশকারী রূপে সমাজে উদ্ভূত হয়েছিলেন। রাখালদের সমাজে পূজা প্রচারের ব্যাপারে মনসার কাহিনী রচনায় বিপ্রদাস, নারায়ণ দেব বা বিজয়গুপ্তের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও এঁরা রাখালদের দ্বারা মনসা পূজার প্রথম প্রচার হয় বলে বর্ণনা করেছেন। আর এই সবক্ষেত্রে দেখা যায় মনসা শক্তি প্রদর্শন করেই পূজার ব্যবস্থা করেছেন। রাখালদের মধ্যে পূজা প্রচারিত হবার পর জেলেদের মধ্যে তাঁর পূজার প্রচার ঘটে। জালুমালু মনসার পূজা করে স্বচ্ছল হয়। রাখালদের পরে জালুমালুর মধ্যে পূজার প্রচলন হয়। এতে বোঝা যায় পূজা এখনো নিম্নবর্গের মধ্যেই প্রচলিত আছে। বিপ্রদাসের বর্ণনা অনুসারে জালুমালুর মার কাছে পূজার কথা শুনে সনকা মনসা পূজা শুরু করেন। এইভাবে নিম্নবর্গের পূজা ক্রমে নারীসমাজের মাধ্যমে উচ্চবর্ণের সমাজে প্রবেশ লাভ করে। আমরা আগেই বর্ণনা করেছি মনসা লৌকিক স্তরে বহুকাল থেকেই পূজিত হয়ে আসছিলেন। পরে উচ্চবর্ণের সমাজে গৃহীত হন। মনসামঙ্গল কাব্য থেকেও এই মত সমর্থিত হয়। মনসা এরপর উচ্চবর্ণের সমাজে পূজালাভ করেন। সম্ভবত এই উচ্চবর্ণের পূজা লাভ করার আগেই মুসলমান সমাজে তাঁর পূজার প্রচার ঘটে। এই মুসলমান সমাজে পূজালাভ করতে তাঁকে কিছুটা শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। উচ্চবর্ণের সমাজে পূজালাভের ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি প্রয়োগের প্রবলতা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। মোটকথা পূজা প্রচারের ক্রম লক্ষ করলেও বলা যায় মনসা ক্রমশ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে দেবী হিসেবে গৃহীত হয়েছেন, এই প্রসঙ্গে বলা

যায় কাহিনীর মধ্যে মুসলমান সমাজে পূজা প্রচারের কাহিনী নিশ্চয় তুর্কি আক্রমণের আগে হওয়া সম্ভব ছিল না। যদি এই কাহিনীকে প্রক্ষেপ না বলা হয় তবে দুটি অনুমান করা যায়। প্রথম অনুমান মনসা পূজার সঙ্গে জড়িত এই কাহিনী মুসলমান আমলের নির্মাণ। গল্পটি মুসলমান আমলের কোনো সময় গড়ে ওঠে। এমনও সম্ভব এর কোনো কোনো অংশ বিশেষত রাখাল ও জালুমালুর কাহিনী ব্রতকথার কাহিনী। এগুলির ধরণ দেখে তাই মনে হয়। ব্রতকতায় যেমন কাহিনীর বিন্যাসগত জটিলতা অপেক্ষা কাহিনীর সরল একমুখী প্রবণতা প্রাধান্য পায় এই দু'টি গল্পের সেই চরিত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি ব্রতকথা আকারে প্রচলিত বলেই মনে হয়। পরে যখন চাঁদ সদাগরের কাহিনীটি প্রধান কাহিনী হিসেবে স্বীকৃত হয় তখন এই ব্রতগুলি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এখন হাসান হোসেনের কাহিনীটি পৃথকভাবে গড়ে উঠেছিল কিনা তা বলা যায় না। তেমন হওয়াও অসম্ভব নয়। রাখাল বা জালুমালুর কাহিনী আগে থেকে প্রচলিত থাকা সম্ভব। পরে এই কাহিনী তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন হল তুর্কী আক্রমণের পরে কেন এরকম একটি লোকপ্রচলিত দেবীর উত্থান হল। তারও কথা আগে বলেছি। সে হল দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে নিজের শিকড়ের সন্ধান। দেশজ দেবতার মধ্যে কোনো উদার ধর্মনৈতিকতার চেয়ে সহজ প্রবৃত্তির উচ্চারণই প্রধান হয়ে ওঠে। দেশীয় সমাজে ভয় থেকে ত্রাণ করার মতো ভয়ঙ্করী এবং কৃপাময়ী দেবীর আবির্ভাব হল। শিব আড়ালে চলে গেলেন। তাঁর সম্পূর্ণ নির্বাসন ঘটল না বটে কিন্তু ভূমিকা খর্ব হল। ফলে শান্ত স্থির শৈব সংস্কৃতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। যে দেবতা ভক্তের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারেন তারই আবির্ভাব হল। দেবতার মোক্ষ বিতরণ ধর্মের তুলনায় ভয় নিরসন করার শক্তি এবং আহ্বান মাত্রেই ভক্তকে সাহায্য করার শক্তিই বড় হল। মনে করা যায় ইসলামধর্মের প্রচার ব্যবস্থা সেকালে অতিশয় তীব্রতা পেয়েছিল। সে তুর্কানা রীতিতেই হোক বা সুফীয়ানা পদ্ধতিতেই হোক ইসলাম ধর্মের প্রবল জোয়ারে গোটা দেশের বহু মানুষ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ভেসে গিয়েছিলেন। অনেকে বলেছেন নিম্নবর্গের মানুষেরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পীড়নে ধর্মত্যাগ করেছিলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও অনেকে বাধ্য হয়ে কিংবা ইচ্ছাক্রমে ধর্মত্যাগ করেন। এই ধর্মপ্রচারের প্রাথমিক উত্তেজনা নিরসন হবার পর সম্ভবত ত্রদেশের মানুষদের মনে আত্মশক্তিতে স্থিতিশীল হবার একটা আগ্রহ দেখা দেয়। সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন ত্রদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার কখনো শক্তিমানের পীড়নে পর্যবসিত হয় নি। কেননা ত্রদেশের মানুষের কোনো প্রতিরোধশক্তি ছিল না। একথা কতোটা গ্রহণ যোগ্য বলা যায় না। কেননা ধর্মত্যাগ করার আগেই অনেকে প্রাণ দিয়েছেন এও ঠিক। তাছাড়া রাজশক্তির সমর্থনপুষ্ট প্রচারক কুলের বিরুদ্ধে দুর্বল ব্যক্তির দাড়াঁনোর সেই শক্তি ছিল না। কিন্তু যখন একটু সুস্থ হবার সময় এসেছে তখনই এই দেশীয় দেবতাদের মধ্যে আশ্রয় সন্ধান করে নিজের শক্তিতে দাঁড়ানোর চেষ্টা হয়েছে।

NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY
166008
২৪ FEB 2004

এই কারণে মনসা চন্ডী ইত্যাদি লৌকিক দেবীদের অবলম্বন করে নিজেদের সংস্কৃতির আশ্রয়ে মানুষ স্থিত হতে চেয়েছে। এটা নিজের ধর্মের আশ্রয়ে পরধর্মের প্রবলস্রোতের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলারও চেষ্টা। সেই জন্য দেখতে পাই মনসা হাসান হোসেন ভাইদের উপরেও নিজের পূজা করার জন্য জোর খাটাতে পেরেছেন। তারা মনসা পূজা করার অর্থ ইসলাম ধর্মের উপরেও হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা। প্রবল শক্তিমান এবং রাজশক্তির সমর্থন পুষ্ট ইসলাম ধর্মের উপরে এই হিন্দুদেবীর প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় সেকালের হিন্দুসমাজের মানুষের মনেও কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল। শিব যে প্রকৃতির দেবতা এই প্রতিরোধে তাঁকে আক্রমণ সম্ভব ছিল না। তাই মনসা চন্ডী প্রমুখের উত্থান এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটলো।

ইসলামের প্রবল আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে হিন্দু সমাজের দিক থেকেও পুনর্গঠনের কাজ শুরু হল। আগে বলেছি তার ভিতরে ছিল নিজের সমাজকে বজ্রবন্ধনে বেঁধে ফেলা। একাদিকে গাজী ফকির দরবেশের প্রচার অন্যদিকে রাজধর্মরূপে প্রবল প্রতিপত্তিশালী ইসলামের হাত থেকে হিন্দুদের সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই কমঠবৃত্তি অবলম্বন করতে হল। অন্যদিকে শুরু হল হিন্দুদের সংস্কৃতিচর্চার চেষ্টা। এরই ফলে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের কাজ হিসেবে বাংলায় সংস্কৃত পুরাণগুলির অনুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ শুরু হল। ভাগবতের শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ বন্দিত হলেন। কৃত্তিবাসের রাম হলেন বাঙালীর দেবতা। লৌকিক স্তরে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করা মানুষগুলির মধ্যেও যোগ সুদৃঢ় হল। উপরন্তু হল এতদিনকার অবহেলিত এই লৌকিক স্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের যোগ। এই লৌকিক স্তরের মানুষের দেবতারা পূজিত হতেন পথে প্রান্তরে গাছের তলায়। তাঁরা একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর ও ভক্তবৎসল। কাজেই এইসব দেবদেবী এবার উপরের স্তর পর্যন্ত উঠে এলেন। এবার উচ্চস্তরের ধর্ম সাধনার বাহ্যিকরূপ নিম্নবর্গের এই দেবদেবীদের উপর পড়ল। লৌকিক দেবতা পৌরাণিক দেবতারূপে অর্চিত হলেন। লৌকিকে পৌরাণিকে একটা মিশ্র প্রকৃতির রূপ তৈরী হল। এইসব দেবদেবী অলৌকিক শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন। রাজনৈতিক জীবনে পরাজয় ও অসহায়তাবোধ থেকে এই অলৌকিক শক্তিধর দেবদেবীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ল। দেবতার সন্তোষের উপরেই মানুষের শুভাশুভ নির্ভর করে এই বোধ প্রবল হল। এখন উচ্চবর্ণের কবিরাও এই সব দেবদেবীর মাহাত্ম্য রচনা করলেন। কবিরা বাংলার এইসব দেবদেবীর শক্তি ও প্রতাপের লোক প্রচলিত আখ্যানের উপর শাস্ত্র পুরাণের প্রলেপ দিয়ে তাকে মঙ্গলকাব্যে রূপায়িত করলেন। এইভাবে বাংলার একটি মঙ্গলসাহিত্য গড়ে উঠলো যা দীর্ঘ পাঁচশো বছর বাংলা সাহিত্যের প্রধান সাহিত্য শাখারূপে পরিগণিত হয়ে আসছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে লৌকিক কাহিনীগুলিরই যে প্রাধান্য সূচিত হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহিনীতে নারীদেবতার প্রাধান্য। বৈদিকধর্মে স্ত্রীদেবতার স্থান একন্তভাবেই গৌণ। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবতা নারী এবং তন্ত্রের পুণ্যভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ। কাজেই মঙ্গলকাব্যে নারীদেবতার প্রাধান্য যদিও অনার্য উৎস থেকে এসেছে, তথাপি আর্য ধর্ম নির্দিষ্ট তন্ত্রসাধনার প্রভাবেই তা জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের নায়ক নায়িকারা প্রধানতঃ বণিক সম্প্রদায় ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চশ্রেণীর প্রাধান্য এই সময়ে অপেক্ষাকৃত গৌণ। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ রাজাদের আমলে (চর্যাপদে) বাঙালী সদাগরেরা সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দ ডিঙার বহর নিয়ে বিভিন্ন পট্টনে বানিজ্য করতে যেতেন্। তাঁদের এই দুঃসাহসিক্ অভিযান নিয়ে যে সব কাহিনী তৎকালে প্রচলিত ছিল, সেই সব কাহিনীই হয়তো মনসামঙ্গল্ কাব্যের মূল আখ্যায়িকার অস্থিকঙ্কালরূপে গৃহীত হয়ে থাকবে। এসব উপাদান থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী মূলতঃ বাঙালীর সামাজিক জীবন অভিজ্ঞতা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের উপাদানে রচিত।

মনসামঙ্গল কাহিনীর উদ্ভব বাংলাদেশে হলেও বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদিরূপটি কোথাও অবিকৃতরূপে রক্ষিত হয় নি। আমরা পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গলের ক্ষুদ্রতর ব্রতকথানুরূপ কাহিনী থেকে বাংলা কাব্যের আদিরূপটি কল্পনা করতে পারি। তারপর বাংলাদেশের কবিদের হাতে লখিন্দর বেহুলার কেন্দ্রীয় কাহিনীর সঙ্গে দেবখন্ডে শিবপার্বতীর বিবাহ ও সংসারজীবন, মনসার জন্ম ও পার্বতীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ, তাঁর নিঃসঙ্গ, আত্মীয় পরিত্যক্ত জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও পূজালোলুপতা ও নরখন্ডে চাঁদের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চাঁদের বানিজ্যযাত্রা ও ভাগ্যবিপর্যয়, লখাই-এর সঙ্গে বেহুলার বিবাহ ও বাসরঘরে সর্পদংশনে তার প্রাণত্যাগ, বেহুলার অসাধারণ মনোবল ও একাগ্রভক্তি বিশ্বাসের ফলে তার মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবন এই সমস্ত বিষয়ের অতি পল্লবিত ও সময় সময় বাস্তব রসপূর্ণ বর্ণনা সংযুক্ত হয়ে কাহিনী এক বিরাট পুরাণের আকার ধারণ করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সমস্ত মনসামঙ্গলেই এই আখ্যানবস্তুর অভিন্নতা লক্ষিত হয়। সারা বাংলাদেশে একই ঘটনা কাঠামোর সর্বস্বীকৃত গ্রহণ নিশ্চয়ই দুই-তিন শতাব্দীর অনুশীলন ও প্রচারের ফল বলা যেতে পারে। এই হিসেব থেকে বলা যায়, মনসামঙ্গলের বীজ তুর্কি আক্রমণের পূর্ব থেকেই জাতীয় চেতনায় উপ্ত ছিল। তুর্কি বিজয় এই পূর্বাগত সমীকরণ প্রক্রিয়াকে কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে। তাই দেশে যখন ইলিয়াসশাহী শাসন ব্যবস্থায় সাহিত্য রচনার এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখনই মনসা কবিগণ সেই সুপ্তবীজকে চারাগাছের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তা ক্রমে

হুসেনশাহী শাসনকালে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। কবি বিজয়গুপ্ত নারায়ণদেব, বিপ্রদাসের কাব্যে হুসেনশাহের সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে বোঝা যায় ঐ সময়ের মধ্যে এই তিনজন প্রতিভাধর শক্তিশালী কবি আবির্ভূত হয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর পূর্ণাঙ্গরূপ গড়ে তুলেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের রচনার এই যুগকে বলা যেতে পারে ঐশ্বর্যের যুগ বা পূর্ণায়তির যুগ। এই কবিরা কাহিনীর একটা স্থির আদর্শরূপ যেমন গড়ে তুলেছেন মাঝে মাঝে কাহিনীতে আবার বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য নানা ঘটনারও অনুবর্তন ঘটিয়েছেন। তবে এই প্রয়াস সবই স্থির কাহিনীবৃত্তকে অবলম্বন করেই আবর্তিত হয়েছে। মনসা কবিদের এই প্রয়াস কখনো নিজ জীবন দৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্যে কখনো বা আঞ্চলিক ভৌগোলিক জীবন যাত্রার প্রয়োজনে আবার কখনো কাহিনীকে সাহিত্য গুণান্বিত করার তাগিদে।

চৈতন্যোত্তর কালে আরো কয়েকজন কবি মনসামঙ্গল কাব্যরচনা করেছিলেন তবে তা ছিল পূর্বের কাহিনীরই গতানুগতিক অনুসরণ। পূর্বের কবিরা কাহিনীর যে স্থিরবৃত্ত রচনা করেছিলেন তাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালের কবিরা কোথাও নিজ যুগরুচিকে, সমাজ জীবনের ঘটনাকে, আবার কখনো চৈতন্য প্রভাবিত জীবন মানবিকতাকে কাব্যের মধ্যে হাজির করেছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কেবলমাত্র মানুষের ধর্মীয় ভাবনায় নয়, শিক্ষায়-দীক্ষায়, রুচি সংস্কারে, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, সেই পরিবর্তনের ঢেউ লক্ষ্য করা যায় এই পর্যায়ের রচিত কাব্যগুলিতে। মোগল পাঠানদের সঙ্গে সংঘর্ষের অস্থিরতার কথাও কাব্যের কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে। ফলে লোকজীবনের মূলোদ্ভূত কাব্যকাহিনী এক নতুন জীবনধর্মী গাঁথায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে আমরা বাংলার প্রায় পাঁচশত বছরের বৃহত্তর জীবনের চিত্র পাই। এই জীবন বৃহত্তর মানবের জীবন।

আমরা জানি, মধ্যযুগের কবিরা আজকের কবিদের মতো এত কল্পনা বিলাসী ছিলেন না, তাঁদের আশপাশে যে জীবন তাঁরা দেখেছেন তাকেই বিভিন্ন উপলক্ষ্যে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। তাই বিভিন্ন কবিদের লিখিত কাব্যে কাহিনীর স্থিরবৃত্তের পাশাপাশি এই নূতন সংযোজিত কাহিনীগুলির গুরুত্ব কম নয়। বরং এই সমস্ত কাহিনীর উদ্ভবসূত্র ব্যাখ্যা করলে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক সমাজ, মানুষের ব্যক্তিগত অভিরুচি, জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মননের অনেক চিত্র পেতে পারি।

সূত্র নির্দেশিকা

১। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার), কল -১২, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১

২। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড পূর্বার্ধ, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কল - ৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা - ১১১

৩। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৮৩

৪। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা - ১১১

৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৮৬

৬। Banerjee J.N., *The Development of Hindu Iconography*, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1974, Page - 3.

৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৩৫

৮। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৬৩

৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৩

১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭১

১১। Sen Sukumar, *Vipradasa's Manasa-Vijaya*, The Asiatic Society, 1, Park Street, Calcutta - 16, Page - 3.

১২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৭১

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৮

১৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ত্রয়োদশ খন্ড, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা - ৮১২

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮০৮

১৬। Collins Randall, *Theoretical Sociology,* University of California, Riversid, Rawat Publications Jaipur and New Delhi, Intraition Ritual; Chapter - 6, Page - 190.

১৭। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কল - ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, পৃষ্ঠা-৪৮১

১৮। তদেব পৃষ্ঠা - ৪৮১

১৯। Banerjee J.N., *The Development of Hindu Iconography*, Page - 345

২০। তদেব পৃষ্ঠা - ৩৩৬

২১। তদেব পৃষ্ঠা - ৩৪৬

২২। তদেব পৃষ্ঠা - ৯৮

২৩। Maity Pradyot Kumar, *Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa,* (Asocio-Cultural Study), Punthi Pustak : Cal - 4, 1966, Page - 47.

২৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা - ।।•

২৫। Maity Pradyot Kumar, *Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa*, Page - 47.

২৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ১৭৩

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৫

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৫

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৬

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৯

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৯

৩২। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খন্ড, পূর্বার্ধ পৃষ্ঠা - ৮২

৩৩। রায় নীহাররঞ্জন বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা - ৪৭৭

৩৪। Bhatta Sali Nalini Kanta, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Published by Indological Book House, Varanasi, Delhi, 1972, Page - 216.

৩৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, পৃষ্ঠা - ৸০

৩৬। Mukhopadhyay K.L., *The Buddhist Iconography, Farma*, 1987, Page - 193.

৩৭। তদেব, পৃষ্ঠা - 221-22

৩৮। Sen Sukumar, *Vipradasa's Manasa-Vijaya*, Introduction, Page - XXX

৩৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাইশা কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, পৃষ্ঠা - ১১.

৪০। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা - ৫৪৩

৪১। দাশগুপ্ত সুরজিৎ, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ যুগোল কিশোর দাস লেন, ১৩৮৩, কলিকাতা - ৬, পৃষ্ঠা - ৩৩

৪২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৪

৪৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০০

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি - ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ২৪৪

৪৫। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), দ্বিতীয় খন্ড জেনারেল, ১১৯ লেলিন সরণী; কলি - ১০, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ২৩১/২৩২

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪৭

৪৮। দাশগুপ্ত সুরজিৎ, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা - ৩৩